বাংলা থিয়েটারের সম্পদ পাপড়ী বসু

ছত্রধর দাস

সেই শিশুবেলার স্মৃতি হাতড়ালেই, কল-কল ঝর্নার জলের মতই সামনে এসে ভিড় করে শিশুদের কলধ্বনি। তখন সবে পাঁচ বছর বয়স। কলকাতার ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের মন্তেশ্বরী ক্লাসের ছাত্রী। জীবনের চলার পথের সৃষ্টিশীল কর্মসূচির প্রায় সবগুলোরই হাতেখড়ি এখানে।

এই বাহাত্তর বছর বয়সেও তাই স্মৃতির এই পাতাগুলো ট্রাঙ্কে তুলে রাখা শাড়ির ভাঁজে সরিয়ে রাখা সযত্ন লালিত গোপন সম্পদের মতই সুরক্ষিত। শাড়ির ভাঁজ সরিয়ে একে একে সামনে মেলে ধরলেন সেইসব স্মৃতিমেদুর মুহূর্ত।

রত্না মিত্র। ডাক নাম পাপড়ী। এই নামেই বেশি পরিচিত। পাপড়ী নামের বানানে 'ঈ' নিয়ে অনেকেই আপত্তি জানিয়েছেন বিভিন্ন সময়ে। রত্না তাদের সবিনয়ে জানিয়ে দিয়েছেন— এই বানানেই তিনি স্বচ্ছন্দ। এক দৃঢ় ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী হলে তবেই না নিজস্ব পছন্দের প্রকাশে এমন নির্ভিক হওয়া যায়।

পছন্দের প্রকাশ নিয়ে সংঘাত হয়েছে নিরন্তর। মাত্র সতের বছর বয়সে বিয়ে হয়ে যাওয়ার ফলে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব হল না। তখন উচ্চমাধ্যমিক মানে ক্লাস ইলেভেন। বিয়ের পর তাই প্রথমে স্কুল-ফাইনাল তারপর প্রি-ইউনিভার্সিটি। ১৯৫০ সালে যার জন্ম এবং ১৯৬৭ সালে যার বিয়ে— তিনি যে বিয়ের পর এভাবে পড়াশোনা চালাতে পারবেন— আর তা যে খুব সহজসাধ্য নয়, সেটা তো বোঝাই যায়।

এখন মেয়েবেলার, বিশেষতঃ কলকাতার মেয়েদের যে স্বাধীন চলাচল অতি স্বাভাবিক, ছয়ের দশকে সেটা যে ততটা স্বাভাবিক ছিলনা তা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু যে মেয়ের এমন নির্ভিক আর বেপরোয়া জেদ, তাকে আটকাবে কার সাধ্য। তাই আরো পড়ার তাগিদ। সঙ্গে চাকরি করার ইচ্ছা তৈরীই ছিল। নিজের পায়ে দাঁড়ানোর অদম্য আকাঙ্খা। ওই সময়ে পাড়ায় পাড়ায় অনেক লাইব্রেরী ছিল যেখানে লাইব্রেরীয়ান পদে সরকারি চাকরির সম্ভাবনা ছিল। তাই করে ফেললেন এম-লিব। অবশেষে চাকরী পেলেন পাড়ার একটি লাইব্রেরীতে। সেখানে কিছুদিন চাকরী করলেন। আবার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম-এ পাশ করলেন। তারপর চাকরি পেলেন একটি কলেজের লাইব্রেরীতে। অবসর নেওয়ার সময় পর্যন্ত এই পদেই চাকরি করে গেছেন।

কিন্তু শুধুমাত্র পড়াশোনা বা চাকরী নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন না পাপড়ী। বাড়ীর রক্ষণশীলতার গন্ডি যত বেশি করে পায়ে বেড়ি পরাতে চেয়েছে, ততই জেদ ঘনীভূত হয়েছে। ওই বেড়ির তোয়াক্কা না করেই বেরিয়ে পড়েছেন বাংলা নাটকের অভিনয়ে। লড়াইটা মোটেই সহজ ছিল না। পরিবারের রক্ষণশীলতা যতই তাঁকে পরিবারের গণ্ডিতে বেঁধে রাখতে চেয়েছে, ততই তিনি পররিবারের মধ্যে থেকেই কর্মভূমি বেছে নিয়েছেন। সহযোগিতাও পেয়েছেন পরিবারের মধ্যে থেকেই। স্বামীর প্রচ্ছন্ন মদত রক্ষণশীলতার গন্ডিকে আলগা করে দিয়েছিল। এভাবেই একদিন এসে দাঁড়ালেন নাটকের অঙ্গনে।

শিশুবেলায় প্রায় ছ'বছর বয়সে মাসির বাড়ি বেড়াতে গিয়ে সীতারাম ঘোষ স্ট্রিটে শিশু শিল্পী হিসাবে প্রথম নাটকে অভিনয় করলেন। নাটকের নাম ছিল "বাংলার বুকে রূপান্তর"।

বিয়ের পর পারিবারিক রক্ষণশীলতার গন্ডি ছেড়ে বেরিয়ে আসতে অনেক যুদ্ধ করতে হয়েছিল। তবে পাপড়ীর একাগ্রতা আর কর্মোদ্যম তাকে স্বাভাবিক স্বার্থকতার দিকে নিয়ে গেছে।

পাপড়ীদির অভিনীত চরিত্রগুলো সবসময় বাস্তবের মাটিতে দাঁড়ানো, আমাদের ঘর-সংসারের মানুষদের চিনিয়ে দিয়েছে। যদিও পাপড়ীদির নিজের কথায় - নেগেটিভ চরিত্র করতেই বেশি ভালো লেগেছে। কারণ তাতে অভিনয়ের স্কোপ থাকে অনেক বেশি।

নাটকের বহমানতায় নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রভারতীর নাটকের ক্লাসে নাট্যচর্চার শিক্ষা নিয়েছেন, কিন্তু নাট্যশিক্ষার শিক্ষক হিসাবে সর্বোচ্চ নম্বর দিতে

চেয়েছেন নির্দেশক বিদ্যুৎ নাগকে। এই বিদ্যুৎ নাগের হাত ধরেই কলকাতায় গ্রুপ থিয়েটারে নাটক করার সূচনা। নির্দেশক হিসাবে কাউকেই রেটিং দেওয়ার পক্ষে মত দেননি পাপড়ী। কারণ, যেসব নির্দেশকের কাছে কাজ করেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই নিজ-নিজ বিচরণক্ষেত্রে দিকপাল।

প্রত্যেকের কাজের ধারা - কাজ করিয়ে নেবার প্রক্রিয়া হয়তো আলাদা। তবে স্বাধীনতা পেয়েছেন সকলের কাছেই। তা সত্ত্বেও নির্দেশক হিসাবে বিদ্যুৎ নাগকে একটু এগিয়ে রেখেছেন এইজন্য যে, তিনিই প্রথম পাপড়ীকে মঞ্চের জন্য গড়ে নিয়েছিলেন। হাতপায়ের জড়তা কাটিয়ে দিয়েছিলেন। এক সময় যে হাত দুটিকে বাড়তি মনে হতো, বিদ্যুৎ নাগ শিখিয়েছিলেন কীভাবে সেই হাতদুটিকে কাজে লাগিয়ে অভিনয়ে নতুন মাত্রা দিতে হবে।

নাটকের চলনে অভিনেতার প্রতি মুহূর্তের অভিব্যক্তির প্রকাশের জন্য তিনটি আবশ্যকীয় তথ্য জেনে নিতে বলেছিলেন নির্দেশক বিদ্যুৎ নাগ - তথ্য তিনটিকে সূত্রায়িত করেই বিগত পঁয়তাল্লিশ বছর কলকাতা সহ ভারতের বিভিন্ন মঞ্চে এমনকি ভারতের বাইরে বাংলাদেশেও মঞ্চায়িত করেছেন অজস্র চরিত্র। বিভিন্ন বিপরীতমুখী চরিত্রের নির্মাণেও নিজেকে মেলে দিতে পেরেছেন স্বচ্ছন্দ সাবলীলতায়। নাট্যশিক্ষকের মতই সেই তিনটি তথ্য প্রকাশ করেছেন ভবিষ্যৎ অভিনেতাদের চরিত্র সৃজনের সহায়তায়। তথ্যগুলি এইরকম :- (১) চরিত্রের বয়স, (২) চরিত্রের শিক্ষা, এবং (৩) কোন অঞ্চলে থাকেন। এছাড়াও কোন ভাসায় কথা বলেন বা কোথা থেকে এসেছেন তার উপরও চরিত্রের অভিব্যক্তি বা কথা বলার ভঙ্গী নির্ভর করে।

বিদ্যুৎ নাগের দল 'প্রোফাইল'-এ 'অশ্বমেধ' নাটকের মাধ্যমে প্রথম কলকাতার গ্রুপ থিয়েটারে অভিনয়ের সূচনা। 'অশ্বমেধ' নাটকটি বিদ্যুৎ নাগের লেখা ও পরিচালনা। সেই সময় এই নাটক কলকাতার নাট্যমোদী মহলে বিশেষ পরিচিতি পেয়েছিল। বিদ্যুৎ নাগ একেবারে নবাগতদের নিয়ে নাটকটির মঞ্চায়ন করেছিলেন। সেই সময় নাটকের দিকপাল মানুষেরাও অশ্বমেধ নাটক দেখেছিলেন এবং নাটকের মঞ্চায়নের সফলতার পাশাপাশি পাপড়ী বসুর অভিনয়েরও প্রশংসা করেছিলেন।

অশ্বমেধ নাটকে পাপড়ীদি 'গীতা' চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। এই অভিনয়ের সুবাদে যে পরিচিতি তিনি পেয়েছিলেন তার সূত্রেই থিয়েটার ওয়ার্কশপে

অভিনয়ের সুযোগ আসে।

থিয়েটার ওর্কাশপে প্রথম অভিনয় করেছিলেন 'লাঠি' নাটকে। রাম মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় এই একাঙ্ক নাটকটিও থিয়েটার ওয়ার্কশপের একটি উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা। তারপর একে একে 'শোয়াইক গেল যুদ্ধে', 'আলিবাবা', 'বেলা অবেলার গল্প' ইত্যাদি নাটকে নানা চরিত্রে অভিনয় করেছেন।

পাপড়ীদি অন্য দলেও ছিলেন সাবলীল। কলকাতার অনেক দলেই তিনি নানা চরিত্রে অভিনয় করেছেন। ফলে অনেক অভিনেতা-অভিনেত্রীর সান্নিধ্যে যেমন এসেছেন তেমনি অনেক পরিচালকের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা পেয়েছেন। উল্লেখযোগ্য পরিচালকদের মধ্যে আছেন - বিভাস চক্রবর্তী, অশোক মুখোপাধ্যায়, রাম মুখোপাধ্যায়, বিদ্যুৎ নাগ, নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত, অসিত মুখোপাধ্যায়, পঙ্কজ মুন্সী প্রমুখ।

পাপড়ী বসু থিয়েটারের পাশাপাশি ছোট পর্দার অভিনয়েও ছিলেন সাবলীল। তাই বলে থিয়েটারকে উপেক্ষা করে কখনো সিরিয়ালের কাজকে বেশি গুরুত্ব দেননি। থিয়েটারকেই প্রাধান্য দিয়েছেন সর্বাধিক। থিয়েটারের প্রয়োজনে সিরিয়ালের কাজ ছেড়ে দিতে পেরেছেন অনায়াসে।

পাপড়ী বসু অভিনীত চরিত্রগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : 'অশ্বমেথ নাটকে 'গীতা', 'আতরবালার খালি কোঠি' নাটকে 'জুবেদা বানু', 'আলিবাবা' নাটকে 'সাকিনা বিবি', 'শমীবৃক্ষ' নাটকে 'কামিনী', 'গজানন চরিত মানস' নাটকে 'নবতারা', 'বিপন্ন বিস্ময়' নাটকে 'নিভা', 'অমর স্মৃতি চ্যালেঞ্জ কাপ' নাটকে 'লতিকা', 'কালীতলার কেলেঙ্কারী ২০২০' নাটকে 'সবিতা', 'সমাপন' নাটকে 'মালতী'। প্রত্যেকটি চরিত্রই দর্শক ও সমালোচকদের সমাদর পেয়েছেন।

ইদানীং পাপড়ীদি আর মায়ের চরিত্রে অভিনয় করতে চাইতেন না। তাই নাটকের চরিত্র নির্বাচনের আগেই নির্দেশকের কাছে একটু অন্যরকম চরিত্রে অভিনয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করতেন। বহু নাটকে মায়ের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। যদিও সব 'মা একরকম ছিলেন না। নেগেটিভ চরিত্রেও অভিনয় করেছেন দাপটের সঙ্গে যেমন 'আতরবালার খালি কোঠি' নাটকে 'জুবেদা বানু' বা 'কালীতলার কেলেঙ্কারী ২০২০' নাটকে 'সবিতা'র চরিত্র।

যেকোন চরিত্রে সাবলীল থাকায় নির্দেশকদের আস্থা পেয়েছেন সবসময়। কোন

নির্দেশককেই অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হতোনা। সমালোচকরা পাপড়ী বসুর অভিনয়কে কখনো তীর্যক বাক্যবাণে বিদ্ধ করেননি। বরং প্রশংসা করেছেন নিরন্তর।

মাত্র ছয় বছর বয়সে মাসির বাড়ীতে গিয়ে নাটক করেছিলেন— 'বাংলার বুকে রূপান্তর'। বিদ্যুৎ নাগের ''প্রোফাইল'' দলের হয়ে দুটি নাটক করেছিলেন— 'অশ্বমেধ' ও 'আতরবালার খালি কোঠি'।

থিয়েটার ওয়ার্কশপের হয়ে 'লাঠি' (১৯৮০), 'শোয়াইক গেল যুদ্ধে' (১৯৮১), 'বেলা অবেলার গল্প' (১৯৮৬), 'আলিবাবা' (১৯৮৯) এই নাটকগুলিতে তিনি অভিনয় করেছিলেন।

প্লেমেকার্স দলের হয়ে অভিনয় করেছিলেন— 'শমীবৃক্ষ' (১৯৯২), 'গজানন চরিত মানস' (১৯৯৪), 'বিপন্ন বিস্ময়' (১৯৯৮)-এই নাটকগুলিতে।

বিভিন্ন সময়ে অন্য দলের প্রয়োজন মেটানোর জন্যও কখনো বিকল্প অভিনেত্রী হিসাবে, কখনোবা প্রধান চরিত্রে অভিনয়ের জন্য ডাক পেয়েছেন অন্য দলের নির্দেশকদের কাছ থেকে। সেইভাবেই কখনো নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত ডেকে নিয়েছেন থিয়েটার কমিউনে অভিনয়ের জন্য। একই ভাবে 'সমীক্ষণ' দলের নির্দেশক পঙ্কজ মুন্সীর ডাকে সাড়া দিয়ে ওই দলের হয়ে 'অন্যভুবন' ও 'মানময়ী গার্লস স্কুল' নাটকদুটিতে অভিনয় করেছিলেন।

'শোহন' দলের হয়ে অনীশ ঘোষের নির্দেশনায় 'লোহাকুট' নাটকে অভিনয় করেছিলেন। অসিত মুখোপাধ্যায়ের ডাকে 'চুপকথা' দলের হয়ে 'জন্মদিন' নাটকেও বিকল্প অভিনেত্রী হিসাবে অভিনয় করেছিলেন।

'নান্দীপট'-এর হয়ে বিভাস চক্রবর্তীর পরিচালনায় 'তীর্থযাত্রা' নাটকে অভিনয় করেছিলেন। এই নাটকের অভিনয়ের জন্য ওই দলের হয়ে বাংলাদেশেও গিয়েছিলেন। শ্যামল ঘোষের নির্দেশনায় ''নক্ষত্র'' দলের হয়ে 'ভাল থেকো' নাটকেও অভিনয় করেছিলেন।

কলকাতা প্লেমেকার্স দলের হয়ে যে নাটকগুলিতে অভিনয় করেছিলেন— 'বিপন্ন বিস্ময়' (২০০২), 'গজানন' (২০১৩), 'অমর স্মৃতি চ্যালেঞ্জ কাপ' (২০১৪), 'কালীতলার কেলেঙ্কারী ২০২০' (২০১৫), 'শমীবৃক্ষ' (২০১৬), 'সমাপন' (২০১৮)।

পাড়ার ফাংশনে পাড়ার দলের ডাকে সাড়া দিয়ে কখনো 'সাজাহান' নাটকে আবার কখনোবা উৎপল দত্ত রচিত 'অজেয় ভিয়েতনাম' নাটকে অভিনয় করেছেন।

এককভাবে অভিনয়ের জন্য নিজেই নাট্যরূপ দিয়ে শরৎচন্দ্রের গল্প অবলম্বনে করলেন নাটক— 'আঁধারে আলো'। আবার নিজের লেখা নাটকও নিজেই অভিনয় করলে— 'রেওভাট'।

এই ভাবেই নাটকে অভিনয়ের জন্য পাপড়ী বসু নিজেই নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন। কলকাতার নাটকের দলগুলিকেও সুবিধামত সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। দলের মধ্যে এবং অন্য দলেও সহ অভিনেতা অভিনেত্রীদের সঙ্গে এক সুন্দর সম্পর্কে মিশে যেতে পেরেছেন অনায়াসে। তরুণতম অভিনেতা-অভিনেত্রীরা তাঁকে যেমন শ্রদ্ধা করেন, তেমনি তাঁর পরামর্শ নিয়ে বহু ক্ষেত্রেই এগিয়ে চলার সাহস পেয়েছেন। কলকাতা প্লেমেকার্স দলের সম্পদ হয়েও তিনি আসলে বাংলা থিয়েটারের বিশেষ সম্পদ।